সারা নিশি থাকবো জেগে

ফরিদ আহমেদ

বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচন্ড কষ্ট আর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন পার করছি। ভেবেছিলাম বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে একটা লেখা লিখবো। কিন্তু সে লেখা আর লেখা হয়ে উঠেনি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মাথার মধ্যে এমনই সুতীব্র যন্ত্রণা তৈরি করেছে যে যতবারই লিখতে বসেছি এক দু' লাইনের বেশি এগুতে পারিনি কখনো। শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য না লিখে বরং অন্য দিকে মনকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। দিন দু'য়েক বাংলাদেশের কোন পত্রপত্রিকাও পড়িনি সবকিছু ভুলে থাকার জন্য। মনে হয়েছে কিছু না জানলেই বরং ভাল। ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যে কোথাও কিছু হয়নি, সব ঠিক ঠিক আছে। দেশে সবাই সুখে আছে, শান্তিতে আছে। বিশ্বাস করতে চেয়েছি ডঃ ইউনুসের অমৃত কথামালাকে, দেশবাসী এখন আনন্দের এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠে বাধনহারা উল্লাসে মেতে উঠেছে। পত্রিকাতে দেখলাম স্টকহোমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের তিনি বলেছেন যে, যা কিছুই হোক না কেন নির্বাচন আমাদের করতেই হবে। বাহ, বেশ মজার কথাতো। নির্বাচন ছাড়া যেন আর কোন বিকল্পই নেই। নির্বাচন আমাদের করতেই হবে তা সে হোক না কেন মাগুরার মত ভোট চুরির নির্বাচন বা ছিয়ানব্বইর মত ভোটারবিহীন নির্বাচন কিংবা পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ফালু সাহেবকে জিতিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার নির্বাচন। ফালু সাহেবকে পরম সৌভাগ্যবান বললাম এই কারণে যে, তিনি নিজেও মনে হয় না কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেননি যে, তার জীবনটা এরকম চরম আনন্দময় হয়ে উঠবে। আকাটমুর্খ এই ব্যক্তির মির্জা আব্বাসের ফুট ফরমায়েস খেটেই সারা জীবন কাটাতে হতো হয়তো। কিন্তু হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগের দৈত্যের কারণে রাতারাতি তার জীবনটা ভরে উঠেছে স্বর্গসুখে। টাকা পয়সা, ক্ষমতার সাথে সাথে এমনই এক অসামান্য জিনিস তিনি পেয়েছেন যে, আমার এক বন্ধু পরজন্মে ফালু হয়ে জন্মানোর জন্য আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন করে যাচ্ছেন নিরন্তর।

শুধু নির্বাচন হলেই হবে না, ডঃ ইউনুস দেখতে চান যে লোকজন সবাই উৎসবের আমেজে নেচে নেচে গান গাইতে গাইতে ভোট দিতে যাচ্ছে । তা সে মিলিটারি বা র‍্যাবের প্যাদানি খেয়েই হোক আর জাতীয়তাবাদী আর সাচ্চা দেশপ্রেমিক জামাতী ক্যাডারদের গুলি বা গ্রেনেড হামলা খেয়েই হোক। হীরক রাজার অনুকরনে জনগণকে বলতে হবে, যায় যদি যাক প্রাণ, তবু হতে হবে উৎসবের নির্বাচন। আর জনগণ বলবেই বা না কেন। শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পাওয়া, সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত এমন একজন হিমালয়সম মানুষ যে ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন এ কথাগুলো। তার মতো ব্যক্তির কথাকে তো বেদবাক্য বলে মানতেই হবে। টেনে টুনে গড়ে সাড়ে পাঁচফুট হয় না এমন বাঙ্গালীদের তিনি নোবেল পাওয়ার পর যাদুর টনিক খাইয়ে লম্বায় দশ ফুট করে দিয়েছেন, আনন্দের হাওয়াই জাহাজে চড়িয়ে এভারেষ্টের শৃঙ্গে নিয়ে গেছেন। এডমন্ড হিলারী আর শেরপা তেনজিং এর এভারেষ্ট বিজয়ের কাহিনী পড়েই এতোদিন বাঙ্গালী এভারেষ্টের শৃঙ্গ সম্পর্কে জেনেছে। এভারেষ্ট তো দূরের কথা ঘরের ভিতরের বাচ্চা সাইজের শৃঙ্গ কেওকেরাডংয়েই উঠা হয়

উঠেনি ঠিকমতো বাঙ্গালীর। সেই বাঙ্গালিকেই এবার ইউনুস সাহেব এভারেষ্টে শৃঙ্গে চড়িয়ে ছেড়েছেন। নোবেল পাওয়ার এমনই মাহাত্ম।

জাতীয়তাবাদীর ছদ্মবেশে মুসলীম লিগাররা আর জামাতীরা ক্ষমতা ছাড়ার সময় নানা পালাবদলের মধ্য দিয়ে ইয়াজ উদ্দিন নামের এক তালপাতার সেপাইকে দাড় করিয়ে দিয়ে তার ঢিলে ঢালা আলখেল্লার নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে। মঞ্চ নাটকে যেমন উইং থেকে প্রোম্পটর স্ক্রিপ্ট পড়ে যেতে থাকে আর অভিনেতা অভিনেত্রীরা তা শুনে ডায়ালগ দিতে থাকে, তেমনি করে আলখেল্লার নিচে থেকে রানীমাতা এবং যুবরাজ যা যা বলছেন ইয়াজ উদ্দিন নামের এই ব্যক্তি যিনি বর্তমানে ইয়েস উদ্দিন নামেই বেশি পরিচিত বেশ নর্তন কুর্দন করে অতি দুর্বল স্বরে তার রানীমাতার অনুকরনে গর্জন করে সেগুলো বলার চেষ্টা করছেন। তার এই নর্তন কুর্দনকে অনেকেই আবার পুতুল নাচ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। রানীমাতা আর যুবরাজ যেভাবে সূতা নাচাচ্ছে তিনি নাকি সেই ভাবেই তন্বী তরুনীদের মতো হাত পা ছুড়ে এবং কোমর আঁকিয়ে বাঁকিয়ে হেলেদুলে নেচে চলেছেন। তার এই মনোমুগ্ধকর নাচ দেখে জাতীয়তাবাদী আর জামাতিরা মহা আনন্দে শাবাস শাবাস বলে হাততালি দিয়ে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। ইয়েস উদ্দিন সাহেব যে শুধুমাত্র সূতার টানেই নেচে চলেছেন এ ব্যাপারে সবাই একমত হলেও আমার ধারণা কিন্তু ভিন্ন। তিনি যে কেবলমাত্র সূতার টানেই নেচে চলেছেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। আমার ধারণা ইয়েস উদ্দিন সাহেব রানীমাতা এবং যুবরাজের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেও ভরত নাট্যম এবং কত্থক নাচের কিছু কিছু শৈল্পিক মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। জীবনের এই শেষপ্রান্তে এসেও তিনি প্রবল আগ্রহে উচ্ছ্বলা কিশোরীদের মতো সেই সব নাচের মুদ্রা দেখিয়ে রানীমাতা এবং যুবরাজকে বিমলানন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আর করবেনই না বা কেন। সামান্য রাষ্ট্রদূত হওয়ার জন্য একসময় তিনি রানীমাতার সামনে হাত জোড় করে কাচুমাচু হয়ে দাড়িয়ে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। যুবরাজের পাদুকা ঘষে ঘষে আয়নার মতো করে দিতেন সারাদিন ধরে। কি এক খেয়ালে রানীমাতা এবং যুবরাজ মিলে (রাজা-রানী আর যুবরাজেরা সাধারণত একটু খেয়ালীই হয়ে থাকেন) রাষ্ট্রদূত তো রাষ্ট্রদূত তাকে একেবারে খোদ বঙ্গভবনে দেশের সবচেয়ে উচু চেয়ারে কোলে করে বসিয়ে দিলেন। তারপর থেকে তিনি তার খর্বাকৃতির শরীরটা সেই বিশাল চেয়ারে আয়েশ করে ছেড়ে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসেন আর পা দোলান। না, পা দোলানো ইয়েস উদ্দিন সাহেবের কোন মুদ্রাদোষ না। চেয়ার একটু বেশী উঁচু হওয়ায় তার ছোট ছোট পা মেঝে পর্যন্ত পোছায় না দেখে বাধ্য হয়েই তাকে পা নাচাতে হয়। কোন কাজকর্ম না করেই শুধুমাত্র মুচকি মুচকি হেসে আর পা দুলিয়ে বঙ্গভবনে বেশ সুখেই ছিলেন তিনি।

কিন্তু পাঁচ বছর পর পর সংবিধান নামের এক আজব জিনিষের কারণে নির্বাচন নামের এক তামাশা করার জন্য রানীমাতা আর যুবরাজকে কিছুদিনের জন্য ক্ষমতার মশনদ থেকে আড়ালে সরে যেতে হয়। অবশ্য না গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কেই বা কি করতে পারতো। কিন্তু রানীমাতার আবার কি এক অদ্ভুত কারণে যেন সংবিধানের প্রতি অন্ধ প্রেম আছে। তিনি সবকিছুই করতে চান সংবিধান সম্মতভাবে। কোন কিছু সংবিধান সম্মত হচ্ছে কিনা তার জন্য তিনি আবার সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন তার রাজজোতিষী মহাজাতক (অনেকে অবশ্য বলে থাকেন মহাপাতক) মওদুদ সাহেবের উপর। হীরক রাজা তার মুর্তি উন্মোচনের জন্য রাজজোতিষীকে লগ্ন খুঁজে দিতে বললে

রাজজোতিষী মধ্যরাতে লগ্ন খুঁজে পায়। রাজা ভেবে দেখলেন এ সময়ে মূর্তি উন্মোচন করলে প্রজারা মুর্তি না দেখে দেখবে অন্ধকার। কাজেই জোতিষীকে দিনের বেলা লগ্ন খূজে দিতে বললেন তিনি। দিনের বেলায় লগ্ন খুঁজে না পেয়ে বিব্রত রাজজোতিষী তখন বলল যে, লগ্নতো সম্রাটের হাতে, পঞ্জিকা কি বলে কি এসে যায় তাতে। রানীমাতার রাজজোতিষী মহাশয়ও তেমনি রানীমাতার পছন্দমত সংবিধানের লগ্ন দেখে দেন। আর সেই সব লগ্ন মেনেই রানীমাতা সব কাজ করে থাকেন আর সবাইকে হাকডাক ছেড়ে হুকুম করেন সেই সব লগ্ন মেনে কাজ করার জন্য। ধর্মযুদ্ধে শহীদ হওয়া রানীমাতার স্বামী প্রাক্তন রাজামশাইয়ের আবার এই সব লগ্ন টগ্নর প্রতি তেমন কোন ভালবাসা ছিল না। তিনি বরং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সংবিধানকে রক্তাক্ত করে দিয়ে প্রবল সুখ অনুভব করতেন। হ্যা-না নামের এক আজগুবী গণভোটে তিনি আটানব্বই শতাংশ জনগণের ভালবাসা পেয়ে যে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন স্বৈরশাসকই ভাঙতে পারেনি। কেউ কোন দিন ভাঙতে পারবে বলেও মনে হয় না। তিনি হচ্ছেন রাজনীতির ডন ব্রাডমান। হাজার চেষ্টা করেও শচীন, লারা বা রিকি পন্টিং এর পক্ষে সম্ভব নয় সেই রেকর্ড ভাঙ্গা। অবশ্য বিশ্ববেহায়া খ্যাত এরশাদ, যে কিনা রাজামশাইয়ের দেখানো পথ অন্ধভাবে অনুকরন করার চেষ্টা করতো, একবার চেষ্টা করেছিল সেই রেকর্ড ভাঙ্গার কিন্তু তাতে নিজেরই হাত পাই ভেঙ্গেছে তার, রেকর্ড তার জায়গায় অক্ষতই থেকে গেছে।

অবশ্য ইয়েস উদ্দিন সাহেব যে একাই নর্তন কুর্দন করে চলেছেন তা কিন্তু না। বলিউডের ছবিতে যেমন নায়ক বা নায়িকার নাচের সাথে একদল সখা বা সখী নেচে চলে তেমনি করে ইয়েস উদ্দিন সাহেবের সাথেও আরো অসংখ্য পাকিস্তানী প্রেতাত্মা রানীমাতার কোরিওগ্রাফিতে দলীয় নৃত্য করে তাকে এবং যুবরাজকে খুশী রাখার জানবাজি চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত দর্শকদের কারণে কাউকে কাউকে হয়তো বাধ্য হয়ে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে পর্দার আড়ালে চলে যেতে হচ্ছে তবে সাথে সাথেই অন্য কোন নৃত্যপটিয়সী বিপুল উৎসাহে সেই জায়গা ভরাট করে দিচ্ছে। ভক্তদের এমন মন ভোলানো নাচ দেখে রানীমাতাতো বেজায় খুশি। নৃত্যের এই তান্ডবলীলা দেখে ঝামেলাবাজ দর্শকরা দুয়ো দিতে দিতে একসময় নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেবে। আর সেই সুযোগে তিনি আবারও সিংহাসনে চড়ে বসবেন। তবে এইবার তিনি আর রানী থাকবেন না বলে মনস্থির করেছেন। গত পাঁচ বছরে পর্দার অন্তরালে থেকে যুবরাজ যেভাবে রাজ্য শাসন করেছে তাতে তিনি বড়ই প্রীত। যুবরাজ যে রাজ্য শাসনে উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন তা বেশ বুঝতে পারছেন তিনি। সেই সাথে সিংহাসনে বসার জন্যও মনে হয় কিছুটা অস্থির হয়ে আছে সে। বেশি দেরি করলে মোগল যুবরাজদের মতো সে আবার রানীকেই সিংহাসন থেকে সরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারে। রানীমাতা তার এই পুত্রকে মনে মনে একটু ভয়ও পান। যে ঠান্ডা মাথায় যুবরাজ বিপক্ষ দলের হইচই করা লোকজনদেরকে পরপারের টিকিট ধরিয়ে দিতো তাতে মাঝে মাঝে রানীমাতার নিজেরও পিলে চমকে যেতো। শহীদ রাজা মশাইও কালো চশমায় চোখ ঢেকে ঠান্ডা মাথায় ভবপারে লোকজনকে পাচার করায় ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু যুবরাজের যে দক্ষতা তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাতে শহীদ রাজা মশাইও যে যুবরাজের কাছে ডাহা ফেল মারতো তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। যুবরাজ তার শহীদ পিতার মতো প্রতিপক্ষকে শুধু পরপারে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হয় না। পরপারে পাঠানোর পর রানীমাতার সুনাম নষ্ট করার জন্য ওই ব্যক্তির ভাই বেরাদার এবং আত্মীয়-স্বজনেরাই তাকে পরপারে পাঠিয়েছে এই অভিযোগে তাদেরকে ধরে নিয়ে এসে রাম ধোলাই

দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী লোকেদের অবশেষে এমনই দশা হতো যে কান্নাকাটি করে নাকে খত দিয়ে বলতে হতো ভিক্ষা চাই না গো মা, তোমার কুত্তা সামলাও। প্রবীন সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক যেমন বলেছেন, আমি আইউব, ইয়াহিয়া কাউকে ভয় পাইনি কিন্তু রানীমাতার এই গুনধর ছেলেকে আমি দারুনভাবে ভয় পাই। কাজেই রানীমাতার ইচ্ছা এই বার তিনি রানীর পদ ছেড়ে দিয়ে সুযোগ্য যুবরাজকে রাজা ঘোষনা দিয়ে রাজমাতা হয়ে বঙ্গভবনে নাতি নাতনীদের নিয়ে সময় কাটাবেন। অনেকদিন ধরেই রানীমাতার মনের খায়েশ বঙ্গভবনে থাকার। দেশের দন্ডমুন্ডের একক কর্তা হয়েও সংবিধানের ঘোর প্যাচের কারণে সেখানে কখনো থাকা হয় নি তার। কিছু না করেই ইয়েস উদ্দিন, রহমান বিশাসের মতো তার পদলেহনকারী ব্যক্তিরা সেখানে থেকে খাট পালংকে শুয়ে আরাম করেছে আর তিনি সারাদিন গাধার খাটুনি খেটেও সেখানে থাকতে পারবেন না তা কি করে হয়। প্রতিপক্ষের ভয়ে আর কতদিন কোটালের পাহারায় সেনা ছাউনীতে ছোট্ট ঘরে থাকবেন তিনি।

এই লেখাটি আসলে শুরু করেছিলাম বিজয় দিবস উপলক্ষে কিছু লেখার জন্য। কিন্তু সে বিষয়ে আসার আগেই রানীমাতা আর যুবরাজের গল্প করে ফেললাম। বিজয় দিবস নিয়ে লিখতে বসতে গিয়ে মনে হলো এই যে বছরের পর বছর আমরা যে বিজয় দিবস করছি। আসলে কি আমাদের বিজয় হয়েছে। বিজয়তো কবেই উধাও হয়ে গিয়েছে পরাজয়ের তিলক চিহ্ন কপালে সেটে দিয়ে। কিন্তু অন্ধের মত আমরা এখনো ভেবে চলেছি যে আমাদের বিজয় অক্ষত রয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যেমন একবার অষ্ট্রেলিয়ার সাথে জেতার পর দশবার হেরে যেয়েও সেই পুরনো জয়ের কথাই বার বার বলে থাকে। আমরাও তেমনি একবার বিজয়ের পর যে দশবার পরাজয়ের কলংক নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি তা ভুলে গিয়েছি অবলীলায়। সুদূর অতীতের একমাত্র বিজয়ের সুখ স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটাচ্ছি এখনো।

শত শত বছর ধরে বিদেশী শাসকদের লাথি গুতা খেতে খেতে বাঙ্গালী পরিনত হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই ভেতো বাঙ্গালীতে। বখতিয়ার খিলজীর তরবারীর নিচে আমাদের পুর্বপুরুষেরা কচুকাটা হলেও ভিনদেশি এই দস্যুই এখন আমাদের জাতীয় মহানায়ক। নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোক রাজা লক্ষন সেন আমাদের কাছে বহিরাগত, কুখ্যাত ভিলেন। ইতিহাস বইতে আমরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করি বখতিয়ার খিলজীর ভয়ে ভীত লক্ষন সেনের খিড়কি দিয়ে পলায়নের দৃশ্য। পাঞ্জাবী মিলিটারির বুটের লাথি খেয়ে আমরা ভেবেছি আহা হুজুরের জুতোটা বোধহয় ময়লা হয়ে গেল আমার নোংরা কাপড়ের ছোঁয়ায়। পরম ভালবাসায় পালিশ করে দিয়েছি সেই জুতো জোড়া। পা টাও টিপে দিতে ভুল করিনি। প্রভু লাথি মেরে পায়ে ব্যথা পেয়েছে কিনা কে জানে। এই ভেতো বাঙ্গালীরই এক পরিবারে কি এক অলৌকিক কারণে হঠাৎ করেই জন্ম হয়ে গেলো এক সিংহ পুরুষের। এতদিনকার বিদেশি প্রভুদের বিরুদ্ধে সিংহের মতোই গর্জন করে উঠলেন সেই সিংহ পুরুষ। আর কি আশ্চর্য হারকিউলিসের মতো এই সিংহ পুরুষের আকাশছোয়া সাহস অতি দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে গেলো খর্বকায় কৃশদেহি বাঙ্গালীর ভীরু হৃদয়ে। সেই সংক্রমনে এক এক জন ভীতু বাঙ্গালী হয়ে উঠলো অমিততেজী বাঘের বাচ্চা। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রূপকথার এই

হারকিউলিসের সাথে বাঘের মতো গর্জন করে উঠলো বাঙ্গালী। আর তারই তোড়ে রচিত হয়ে গেলো বাঙ্গালীর ইতিহাসের একমাত্র বিজয়গাথা।

কিন্তু বিজয়ে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী সেই বিজয় ধরে রাখতে পারেনি বেশিদিন। বহু শতাব্দী পরে পাওয়া একমাত্র বিজয়ের আনন্দে বিভোর বাঙ্গালীর আত্মমগ্নতা আর নিজ শক্তিমত্তায় অতি বিশ্বাসী সিংহপুরুষের অসচেতনতায় গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গুটি গুটি পায়ে জোটবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো পরাজিত হায়েনার দল। পচাত্তর সালে সিংহপুরুষকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে আবারো পরাজয়ের কালিমা লেপ্টে দিল হায়েনারা বাঙ্গালীর কপালে চিরস্থায়ীভাবে। অবশ্য এর মধ্যে সুযোগ এসেছিল একবার। কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বুদ্ধিতার কারণে সে সুযোগও হারিয়ে ফেলেছে বাঙ্গালী আবার। কাজেই যে বিজয় দিবস আমরা পালন করছি তা আসলে পরাজয়ের কালিমা দিয়ে ঢাকা। আলোর নামে জমাট অন্ধকারই জাকিয়ে বসে আছে এখনো। বিজয়ের আনন্দ উদযাপনের নামে আসলে পরাজয় বন্দনাই করছি আমরা প্রতি বছর।

পচাত্তর সালের পর থেকেই পাকিস্তানপন্থী এই হায়েনাদের রাজত্বের শুরু। রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাদের পক্ষে তখন আর সম্ভব ছিল পুনরায় বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানো। কিন্তু এর কাঠামোকে পাকিস্তানী মডেলে সাজানোতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি তাদের। এখন যে বাংলাদেশ আমরা দেখছি সে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের সেই প্রিয় মাতৃভূমি নয়। আমাদের পরম ভালবাসার বাংলাদেশ আজ ছিনতাই হয়ে চলে গেছে তাদের হাতে যারা একদিন সর্বশক্তি দিয়ে, চরম নৃশংসতা দিয়ে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল এর জন্মকে। বাংলাদেশের মোড়কের ভিতরে এখন নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে তাদের প্রিয় পাকিস্তান। বাংলাদেশ এখন পরিনত হয়েছে বাংলাস্তানে। এই বাংলাস্তানে বাঙ্গালীরা এখন অনাহুত, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বা দেশদ্রোহী। যে মা তার সদ্য কৈশোর উত্তীর্ন ছেলেকে নিজ হাতে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন দেশের মুক্তিযুদ্ধে, হারিয়েছিলেন তার অতি আদরের মেধাবী সন্তানকে, তাকেই মারা যেতে হয়েছে দেশদ্রোহীর কলংক মাথায় নিয়ে। যে ভদ্রলোক তার সমস্ত মেধা দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে সদ্য স্বাধীন একটা দেশের জন্য তৈরি করেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান, তাকেও এখন দেশদ্রোহীর মামলায় ফেলে দিয়ে জাতীয়তাবাদী পুলিশ ফন্দিফিকির খুঁজছে গ্রেফতার করার। আর যারা পাকিস্তান আর্মির সাথে গণহত্যা চালিয়েছিল, ধর্ষন করেছিল অসংখ্য মা বোনকে, তারা আজ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক। এখন সকাল বিকাল সবাইকে দেশপ্রেমের সবক দেয় তারা, পতাকা লাগানো গাড়ীতে করে পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায়। এমনি পোড়া কপাল আমাদের। নিজামী-মুজাহিদের কাছ থেকে এখন শুনতে হয় দেশপ্রেমের কথা। যে দেশে নিজামী মুজাহিদরা দেশপ্রেমিক সেই দেশে দেশদ্রোহী হওয়াটাই অনেক বেশি মর্যাদার, অনেক বেশি গৌরবের। দেশপ্রেমিক হওয়াটাই বরং চরম লজ্জার আর চুড়ান্ত অপমানের বিষয়।

তবে নিজাামী-মুজাহিদদেরও কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি এখনো। আগামীতে রানীমাতা আবার সিংহাসনে বসলেই নিজামীকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী করা হবে। তাহলে আর তাকে রাজাকার আলবদর বলে কেউ গালি দিতে পারবে না। জাতীয় সঙ্গীত পালটানোর দাবীতো তারা করে আসছে সেই কতদিন ধরেই। ভারতীয় এক হিন্দুর লেখা

গান ইসলামের পূন্যভূমি বাংলাস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হবে তা কি করে হয়। আর কিছুদিন সময় পেলে জাতীয় পতাকার লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা লাল সূর্যকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ঢুকে যাবে পবিত্র চাঁদ-তারা। দিনের আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই যে বেশি পছন্দ এই সব অন্ধকারের জীবদের।

অসংখ্য জনপ্রিয় গানের রচয়িতা অকাল প্রয়াত গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের জন্য বুকের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে লিখেছিলেন তার অমর গান 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'। গুনী শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনও অন্তরের সবটুকু আবেগ উজাড় করে দিয়ে গেয়েছিলেন সেই অসাধারণ গান। অনেকের মতই আমারও অসম্ভব প্রিয় এই গানটি। এই গানের কয়েকটি লাইন এরকমঃ

আজ আমি সারা নিশি থাকবো জেগে
ঘরের আলো সব আঁধার করে
ওরা আসবে চুপি চুপি
কেউ যেন ভুল করে গেও নাকো মন ভাঙ্গা গান।

বাবু তার অনুভুতি দিয়ে সেই কবে ঠিকই টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে, যে গান এখন বাজছে তা মন ভাঙ্গা গান। তারপরও তিনি লক্ষ লক্ষ শহীদ যারা তাদের জীবন দিয়েছিলেন এই দেশের জন্য তাদের মন যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য নিষেধ করেছিলেন ভুল করেও এ গান না গাইতে। সেই মধ্য আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর যখন দেশ, জাতি আর রাজনৈতিক বিষয়সমূহের প্রতি একটু একটু করে ধারণা জন্মাচ্ছে তখন থেকেই বাবুর মত যন্ত্রণার নীল সমুদ্রে ভেসে আমিও অসংখ্য নিশি কাটিয়েছি জেগে জেগে। বিরানব্বইর পঁচিশে মার্চের রাতে বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলের সমর্থনে ঢাকার রাজপথে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে মিছিল বের হওয়া, আটানব্বই এ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সমর্থনে দর্শকদের উদ্দাম উল্লাস দেখে রক্তাক্ত হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে নির্ঘুম কেটেছে অনেক অনেক সুদীর্ঘ রজনী। তবে যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়ার দিন এখানেই শেষ নয়। এরকম নির্ঘুম রজনী অনাগত দিনে যে আরো পাড়ি দিতে সে কথা বেশ ভাল করেই জানি।

আমাদের আগের প্রজন্ম তাদের প্রথম তারুন্যে ভালবাসার রমনীর হাত ধরার আগেই দেশ মাতৃকার দুর্দিনে হাতে তুলে নিয়েছিল বন্দুক। একটা প্রজন্মের অসংখ্য তরুন জানলোই না কেমন লাগে ভালবাসার মানুষের চোখে চোখ রাখতে, কি রকম অনুভূতি হয় নিজের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে, কি ধরনের আনন্দে মানুষ ভেসে যায় নাতি নাতনির হাত ধরে হাটার সময়। তার আগেই দেশ আর দেশের মানুষের জন্য সব ত্যাগ করে চলে গেল তারা। আর আমরা কি অদ্ভুতভাবেই না তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হতাশার এই দুর্ভেদ্য পাথর দেয়ালের বাইরে কি আশার কোন অস্তিত্ব নেই? আছে, নিশ্চয়ই আছে। যত জমাট হোক না কেন সব মেঘের আড়ালেই যেমন লুকিয়ে আছে সোনালী সূর্যের উজ্জ্বল হাসি। তেমনি করে ঘোর কৃষ্ণ এই আঁধারের মাঝেও টিম টিম করে জ্বলছে সামান্য কিছু আলোর শিখা। যখন দেখি দেড়মাস ধরে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান চার উপদেষ্টা নোংরা পঙ্কিল থেকে মাথা উঁচু করে বের হয়ে এসেছেন, একপাল হিংস্র হায়েনার সামনে বুক চিতিয়ে দাড়িয়ে তানিয়া আমীর পালটা ধমক দিচ্ছে, সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী পুলিশ ক্যাডারদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েও নিরস্ত্র তরুনীরা লড়াই করছে, তখন সত্যজিৎ রায়ের গণশত্রুর ডাক্তারের মতো বলতে ইচ্ছে করে এখনো তাহলে আশা আছে।

ক্ষীন এই আশাটুকু নিয়েই হয়তো বিজয় দিবসের এই রাতটাও আগের মতোই ঘুমহীন কাটিয়ে দেবো।

ক্যালগারি, ক্যানাডা
farid300@gmail.com